বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমার পচিঁশ বছর : অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তি

তানভীর মোকাম্মেল

দেখতে দেখতে সিকি শতাব্দী পেরিয়ে গেল। সময় কত দ্রুতই না বয়ে যায়! বন্ধু মুরাদের সঙ্গে ওর মোটর সাইকেলের পেছনে বসে *"হুলিয়া"* ছবির কাজে ঘোরা, মোর্শেদ *"আগামী"* বানানোর পর দু'জনে মিলে একই টিকেটে *"আগামী"* ও *"হুলিয়া"* ছবি দুটি একসঙ্গে দেখানোর নানা আয়োজনের প্রচেষ্টা। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র দেখানোর সেই সব দিনগুলি আজ পঁচিশ বছর পরে গভীরভাবে মনে পড়ে। পঁচিশ বছর পরে আজো তো কমবেশী একই কাজ করে চলেছি! এই নানাভাবে নানারকম ছবি তৈরী করা ও বিকল্পভাবে তা দেখানো। আর এই দীর্ঘ চলার পথে অভিজ্ঞতার ভান্ডারে সঞ্চয়ও তো কম হোল না। কিছু তার আনন্দের, আর অনেকটাই হয়তো বেদনার।

অভিজ্ঞতা-এক : বেশ কয়েক বছর আগের কথা। দাকোপ থেকে কাঁচিকাটা নদীর পার ধরে দীর্ঘপথ ভ্যানে চেপে বৈঠাঘাটা চলেছি। সঙ্গে ফিল্মের প্রিন্ট, ঢাউস পর্দা, ১৬ মি: মি: প্রজেক্টর। বৈঠাঘাটায় ছবির শো হবে। গ্রামের লোকজন তাকিয়ে দেখছে। নিজেদের মনে হচ্ছে যাত্রা দলের লোক। বৈঠাঘাটায় পৌঁছানোর পর শো-য়ের আয়োজক কলেজের অধ্যাপক বন্ধুটি আড়ালে ডেকে আমাকে বললেন *"এ কী অবস্থা আপনাদের! দর্শকদের কাছে প্রেস্টিজ বলে একটা ব্যাপার আছে না! সবাই জানে আপনারা গাড়ীতে আসছেন! ফিল্মের পরিচালক, প্রাইভেট কারে, অন্তত: মাইক্রোবাসে আসবেন তো! তা না ভ্যান গাড়ীতে!! তাও এই অবস্থায়!"* (তাকিয়ে দেখি জামা-কাপড়ে অনেক জায়গাতেই কাদা লেগে আছে!) আয়োজক বন্ধুটিকে তো আর বলা গেল না যে ভ্যানগাড়ীর ভাড়াটাও বেশ কষ্টে যোগাড় করা হয়েছে! এখানে ছবির টিকিট বিক্রি হলে হাতে কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। প্রেস্টিজ নিয়ে ভাবার অবসর কোথায়!

অভিজ্ঞতা-দুই : চট্টগ্রাম শহরের মুসলিম হলে ছবির শো। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, রাত-জেগে-শহরে পোস্টার লাগিয়ে, পর্দা খাটিয়ে, প্রজেক্টর লাগিয়ে বসে আছি। দর্শকেরাও এসেছে। ছবি শুরু হবে হবে। এমন সময় এক গাড়ী ভর্তি পুলিশ! বুটের খট্ খট্ আওয়াজ তুলে এক ডিএসপি সাহেব এসে বললেন *"ছবির শো বন্ধ"। "কেন?", "ডিসি সাহেবের হুকুম!", "সরকারের সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়া ছবি। ডিসি ছবি বন্ধ করার কে?" "ওসব বুঝি না। ছবির শো বন্ধ।.... আপনার কিছু বলার থাকলে ডিসি সাহেবকে বলবেন।"* ডিসির সঙ্গে কথা বলার জন্য পুলিশের গাড়ী আমাকে তুলে নিল। উপস্থিত জনতা ভাবল আমাকে বোধহয় গ্রেপ্তার করেছে! ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা, শহরে নানা গুজব!..... পরে অবশ্য ছবি শুরু করা গেল। কিন্তু সে আর এক কাহিনী!

অভিজ্ঞতা-তিন : খুলনা শহরের প্রেসক্লাবে ছবির শো হবে। সব আয়োজন সম্পন্ন। সাংবাদিকেরাও খুব উৎসাহী। শো-য়ের দিন সকালে প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারীর ফোন *"শো করা যাচ্ছে না!..... পুরো প্রেসক্লাব পুলিশ ঘিরে রেখেছে!"* জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি আমার

---

* লেখাটি *"বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমার বিশ বছর : অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তি"* শিরোনামে **'দৃশ্যরূপ'** পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

> বাসার গেটের সামনেও এক ট্রাক পুলিশ। পুলিশের বড়কর্তাকে টেলিফোন করলে জানালেন *"আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেই এটা করা হয়েছে। খবর পেয়েছি ছবির শো হোলে ইসলামী মৌলবাদীরা বোমা মারবে!"*

বিকল্পভাবে ছবি বানানো কেবল নয়, বিকল্পভাবে ছবি দেখানোও সহজ নয় বাংলাদেশে। এ পথে, বলতে পারেন, *পথে পথেই পাথর ছড়ানো* ! তবু এর মধ্যেই ছবি তৈরী হয়েছে, দেখানোও হয়েছে, হচ্ছে।

আশির দশকের শুরু থেকে এদেশে বিকল্পধারায় স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ ও প্রদর্শনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তা হঠাৎ করে আসেনি। সে সময় যারা ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন করতেন তাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, ইচ্ছা ও পরিকল্পনা এর পেছনে কাজ করেছিল। আমাদের অতীত লেখালিখি একটু ঘাটাঘাঁটি করলে দেখা যাবে যে দীর্ঘকাল ধরেই আমরা প্যারালাল সিনেমার কথা বলে এসেছি। বাংলাদেশের বিকল্প সিনেমার আজ যেটুকু বিকাশ তা হয়তো পুরোপুরি আমাদের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি, তবে খুব দূরেও যায়নি।

হলিউডী দুই-আড়াই ঘন্টার বাঁধন ভেঙ্গে মুক্তদৈর্ঘ্যের অন্বেষা, শিল্পী হিসেবে আমাদের স্বাধীনতার অন্বেষা। সঙ্গতকারণেই যাত্রাটা স্বল্পদৈর্ঘ্যের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল। কারণ স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানানো আমাদের আর্থিক ক্ষমতা ও আওতার মধ্যে ছিল। পর পর বেশ কিছু ছবি এই ধারায় তৈরী হোল এবং জনগণ ইতিবাচকভাবে তা গ্রহণ করল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে *"স্বল্পদৈর্ঘ্য"* শব্দটাই যে কোনো শিল্পিত ও সমাজসচেতন চলচ্চিত্রেরই একটা অভীধায়, এক ধরণের generic term-য়ে পরিণত হোল। ফলে দেড় ঘন্টার *"মুক্তির গান"* বা সোয়া দুই ঘন্টার *"নদীর নাম মধুমতী"* সম্পর্কেও লোকজনকে, এমনকি মিডিয়াকেও, বলতে শুনি— *"স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র"*!

ছবিগুলি মূলত: ১৬ মি: মি:-য়ে তৈরী হয়েছিল। ১৬ মি: মি:— কারণ তা সস্তা। তাছাড়া ১৬ মি: মি:-য়ের প্রজেক্টর সহজে পাওয়া যায়, সহজে বহনযোগ্য। প্রাতিষ্ঠানিক ৩৫ মি: মি:-য়ে ছবি না বানিয়ে ১৬ মি: মি:-য়ে ছবি বানানোর ফলে একটা সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। কিছুটা কেতাবী ভাষায় বললে, উৎপাদন শক্তিতে পরিবর্তন এনে আমরা উৎপাদন সম্পর্কেও পরিবর্তন ঘটাতে পারলাম। নির্মাতারা নিজেরাই নিজেদের প্রিন্টের মালিক হতে পারলেন। এতে সুবিধা হোল যে মূলধারার কোনো নির্মাতা যেখানে তাঁর নিজের ছবি ইচ্ছামত দেখাতে পারেন না সেখানে *"চাকা"* বা *"চিত্রা নদীর পারে"*-র নির্মাতারা তাঁদের ছবি কিন্তু তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী যেখানে খুশী যখন খুশী দেখাতে পারেন। নিজের সৃষ্ট শিল্পের উপর এই পূর্ণ অধিকার— শিল্পীর বিশেষ ও একান্ত এক অধিকার। বাংলাদেশের বিকল্পধারার পরিচালকেরা সে অধিকারটা অর্জন করতে পেরেছেন যেটা মূলধারার সবচে শক্তিশালী পরিচালকেরাও পেরে ওঠেননি।

১৬ মি: মি:-য়ে ছবি বানানোর ফলে বিকল্পধারার নির্মাতারা আরেকটা সুবিধাও পেয়েছেন। তা হচ্ছে এফডিসি-র আমলাতান্ত্রিক বাঁধন, ব্যবসায়ী নিয়মকানুন ও সর্বোপরি ওখানকার অসুস্থ পরিবেশের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন।

নারীর বিরুদ্ধে শোষণ, শিশুশ্রম, মাদকাশক্তির সমস্যা, এসব নানা বিষয়ই বিকল্পভাবে নির্মিত এসব চলচ্চিত্রে এলেও এ ধারার মূল থীমটা যেন ছিল— ১৯৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ। একটা leit motif-য়ের মত মুক্তিযুদ্ধ বারবার এসব ছবিতে ফিরে এসেছে। কারণটা হচ্ছে যাঁরা বিকল্পধারায় কাজ করতে এসেছিলেন সেই প্রজন্মের তরুণদের দেখা জীবনের সবচে বড় ঘটনা, নিঃসন্দেহে— ৭১-য়ের মুক্তিযুদ্ধ।

আশি-নব্বইয়ের দশকে এই ধারায় অনেকেই ছবি বানাতে এসেছিলেন কিন্তু আমরা দেখি তাঁরাই টিকে থাকতে পেরেছেন যারা ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তাদেরই কেবল এভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের সাংস্কৃতিক, নান্দনিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল।

এই যে আমরা বিকল্প সিনেমা বলছি এর অনুষঙ্গগুলি কী কী, উপাদানগুলিই বা কী কী, কাকে বলব বিকল্প সিনেমা? কাকে নয়?

আসলে বিকল্প সিনেমার কোনো একটাই সংজ্ঞা নেই। একেক দেশে একেকভাবে তার জন্ম ও বিকাশ ঘটে। এটা অনেকটাই নির্ভর করে সেদেশের মূলধারার চলচ্চিত্রের অবস্থা, রাষ্ট্রটির গণতান্ত্রিক মান, কারিগরী অবকাঠামো, সমাজের সহনশীলতার অবস্থা, সেন্সর ব্যবস্থা, দর্শকদের রুচির মান, সরকারী ও বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা, টেলিভিশনের সমর্থন, এসবের উপর। দুঃখজনক যে বাংলাদেশে এর কোনোটাই বিকল্প সিনেমার অনুকূলে নয়।

বিকল্প সিনেমার উপাদান হিসেবে প্রথমেই বলব— ছবির বিষয়বস্তুর কথা। বিকল্প সিনেমার বিষয়বস্তুতে এমন কিছু থাকা কাম্য যা মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে সাধারণত: থাকে না। এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধী এমন কিছু সাহসী বক্তব্য যা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় দর্শন বা সামাজিক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে। বা এমন কোনো বিষয় যার কোনো বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নেই বলে মূলধারার চলচ্চিত্র যেসব বিষয়ে আগ্রহী নয়। যেমন একটা মৃতদেহ গরুর গাড়ীতে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া— *"চাকা"*, কিম্বা দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের একটা হিন্দু পরিবারের কী সমস্যা হোল— *"চিত্রা নদীর পারে"*, যেসব বিষয় নিয়ে এদেশের চলচ্চিত্রের মূলধারায় ছবি করার কথা কেউ ভাবেই না।

পশ্চিমা চলচ্চিত্র উৎসবগুলির দিকে তাকিয়ে, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে, পশ্চিমাদের পছন্দ এমন বিশেষ ধরণের কিছু বিষয় বেছে নিয়ে কারিগরীভাবে মসৃণ একধরণের *"বিকল্প"* (!) ছবি তৈরী হয়। ভারতে প্রায়শ:ই এধরণের কিছু ছবি আমরা নির্মিত হতে দেখি। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও তেমনটি হয় না। এখনও এদেশের বিকল্প ছবিগুলির বিষয় দেশীয় প্রয়োজনে দেশীয়ভাবেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

আরেকটা প্রবণতা আমরা অন্যান্য অনেক দেশে লক্ষ্য করি। তা হচ্ছে *"বিকল্প"* ছবির মাঝে কিছু যৌনাত্মক দৃশ্য রাখা, মূলত: বাণিজ্যিক বিবেচনায়। যেমন গোবিন্দ নিহালনীর *"আক্রোশ"*-য়ের যৌনমিলনের দৃশ্যটি অথবা রবীন্দ্র ধর্মরাজের *"চক্র"*-তে স্মিতা পাতিলের স্নানদৃশ্যটি। বাংলাদেশে এখনও সে প্রবণতা নেই। যেটা এখানে লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাঁধানিষেধের আরোপিত মাত্রাকে একধরণের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমেই এসব ছবি জনপ্রিয়তা পায়।

বাংলাদেশের বিকল্পধারার ছবির আরেক উপাদান, ছবিগুলির— নির্মাণপ্রক্রিয়া। বিশাল পুঁজি, বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের তারকারা, অনেক লোক-লস্কর, বিশাল প্রডাকশন-ডিস্ট্রিবিউশন অফিস, এসব ছাড়াই কিছু বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের নিয়ে ছবি তৈরী করা। বিকল্প এই নির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আরো থাকছে চিত্রনাট্যের পৃথক ধরণ, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শৈল্পিক ব্যাকগ্রাউন্ড, শুটিং ইউনিটের গড়ন, লোকেশন নির্বাচন, ফিল্মের ফরম্যাট (অনেক ক্ষেত্রেই তা ১৬ মি: মি:। আবার ভিডিও আঙ্গিকেও চমৎকার কাহিনীচিত্র বানিয়েছেন শামীম আখতার— *"শিলালিপি"*) এবং সর্বোপরি— বিকল্প বিতরণ ব্যবস্থা। চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে প্রদর্শন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটাই নির্মাতা নিজেই নিয়ন্ত্রণ করছেন কোনো প্রযোজনা বা পরিবেশক সংস্থা ছাড়াই।

বিকল্পভাবে ছবি বাংলাদেশে খুব সামান্য সংখ্যকই তৈরী হয়েছে। সত্যিকারের ভালো ছবির সংখ্যা তো একেবারেই হাতে গোনা। তবুও বলব এ ধারার কিছু সাফল্য রয়েছে। প্রথমত: এফডিসি-র প্রাতিষ্ঠানিক স্টুডিওপ্রথার বাইরে ছবি তৈরী করে, এবং সিনেমা হলের বাইরে কোনো মিলনায়তনে সেসব ছবি প্রদর্শন করে, বাজারী প্রদর্শক-পরিবেশক ও হলমালিকদের অশুভ চক্রটাকে এড়িয়ে এদেশেও যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা ও তা দেখানো সম্ভব সেটা প্রমাণ করা গেছে।

মূলধারার চলচ্চিত্রকে ঘিরে রহস্যের যে মোহজাল গড়ে তোলা হয়ে থাকে সেটা ভাঙ্গা গেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের গোটা প্রক্রিয়াটার বি-রহস্যকরণ (demystification) ঘটানো গেছে। এখন যে কেউ ছবি বানাতে পারেন— যদি তার প্রয়োজনীয় নান্দনিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি থাকে। চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ণ ঘটানো গেছে যেটা বিকল্প চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে আমি মনে করি। ভিডিও ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের ফলে এই সম্ভাবনা এখন উন্মুক্ত আকাশের মতই অসীম।

তবে বিকল্পধারার চলচ্চিত্রের বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। প্রথমত: ছবির সংখ্যা খুবই কম। আরেক সমস্যা নতুন ছেলেরা তেমন আসছে না। সম্প্রতি এ. কে. এম. জাকারিয়ার *"ইতি সালমা"*, আশিক মোস্তফার *"ফুলকুমার"* ও এন. রাশেদ চৌধুরীর *"বিস্মরণের নদী"*-র মত নিরীক্ষায় সাহসী কিছু ভাল উদ্যোগ দেখা গেলেও ধারাবাহিকভাবে এ ধারায় নতুন ছবি তেমন আসছে না। ফলে জেলা-উপজেলায় যেসব ফিল্ম সোসাইটি, ছাত্র-সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আমাদের ছবিগুলি নিয়ে প্রদর্শন করত সেই প্যারালাল নেটওয়ার্ক ক্রমশ: নির্জীব হয়ে পড়ছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে ছবি দেখানোর ফলে কখনো হয়তো কিছু পয়সা পাওয়া গেছে, কখনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু জেলা-উপজেলায় ছড়ানো এসব সাংস্কৃতিক সংগঠনই হচ্ছে সেইসব শিরা-উপশিরা যাদের মাধ্যমে বিকল্প সিনেমাকে রাজধানীর বাইরে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া আজো সম্ভব। সাধারণভাবে জনগণের মাঝে আমাদের ছবিগুলি দেখার কৌতুহল রয়েছে। প্রয়োজন কেবল ছবিগুলি তাদের কাছে— সঠিকভাবে পৌঁছানো।

তবে বিকল্পধারার অনেক ছবিরই কারিগরী মানে সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে শব্দগ্রহণের ক্ষেত্রে। অনেক ছবি আবার টিভি-নাটকের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ফলে জনগণ সেসব ছবিকে তেমন গ্রহণও করেনি।

তাছাড়া প্রথমদিককার অনেক ছবিতে, আবেগটা বড্ড বেশী দেখা গেছে। মধ্যবিত্তের জোলো আবেগ। শিল্প হয়ে ওঠার জন্যে আবেগকে জারিয়ে পরিশীলিত করা, সেটা তেমন ছিল না। অভাব ছিল দর্শকের মননের উপর আস্থারও।

কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিভঙ্গির। যেসব বিকল্প ছবিতে সাহসী কিছু বক্তব্য রয়েছে তা নানাভাবে আটকে দেবার নানা প্রক্রিয়া এখনও চলছে। সরকার মানেই আমাদেরকে মনে করে— শত্রু! কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী একটা সরকারের জানা উচিৎ যে একজন স্বাধীন চলচ্চিত্রনির্মাতার কণ্ঠস্বর— গণতন্ত্রেরই কণ্ঠস্বর। এ ব্যাপারে সরকারের সেন্সর বোর্ড এক— বড় নুইসেন্স। বিকল্পধারার এমন কোনো ছবির কথা আমি মনে করতে পারি না, সেই *"আগামী"* থেকে *"মুক্তির গান"*, যেখানে সেন্সর বোর্ড ঝামেলা পাকায়নি। *"নদীর নাম মধুমতী"* ছবিকে হাইকোর্টে যেয়ে ছাড়পত্র পেতে হয়েছে। *"স্মৃতি '৭১"* আজো ছাড়পত্র পায়নি!

জেলা-উপজেলায় বিকল্পভাবে ছবি দেখানোর এক সমস্যা হচ্ছে— অর্ধশিক্ষিত আমলা-ফয়লারা। ছবির সেন্সর সনদ থাকলেও ওসি-ডিসিরা অনুমতির নামে নানারকম ঝামেলা পাকায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

সিলেটে *"লালসালু"*-র প্রদর্শনীর কথা। এক এসপি প্রায় গায়ের জোর দেখিয়ে সেখানে ছবিটার প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছিল!

দীর্ঘদিন অনীহা দেখালেও বিকল্পধারার কিছু ছবি আজকাল সিনেমা হলগুলি দেখাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ সিনেমাহলের ইতর পরিবেশের কারণে সিনেমা হলের সঙ্গে দেশের রুচিশীল ও সংবেদনশীল মানুষদের একটা বড় রকমের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে মহিলা দর্শকেরা আর সিনেমাহলে যানই না তেমন।

বিকল্প চলচ্চিত্রগুলি ব্যাপক মানুষকে দেখানোর একটা ভালো মাধ্যম হতে পারে প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলি। কিন্তু প্রাইভেট টিভিওয়ালারা মূলত: ব্যবসায়ী। এঁরা ছবি দেখাতে এত কম টাকা দিতে চান যে খরচে পোষায় না। আর বিটিভি তো এ ধারার ছবিগুলি না দেখাতে পারলেই খুশী! সরকারী মন্ত্রী-আমলারা সেমিনারে-অনুষ্ঠানে-চলচ্চিত্র উৎসবে দেশীয় ভালো ছবির পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে অনেক মধুর মধুর কথা বললেও বিকল্পধারার ছবিগুলো দেখাতে বিটিভি-র পরিস্কার অনাগ্রহ রয়েছে।

দীর্ঘদিন বিকল্পধারার চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে আমার কিছু কিছু উপলব্ধি জন্মেছে। সেগুলি সম্পর্কে এখন কিছু বলতে চাই।

৩৫ মি: মি:-য়ে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য বাণিজ্যিক ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হলে আমাদেরকেও বড় দৈর্ঘ্যের ছবি বানাতে হবে। কেবল স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিই যথেষ্ট নয়।

অধিকাংশ বিকল্পধারার ছবির প্রিন্ট ও শব্দের মান ভালো নয়। আমি মনে করি সৌখিনতার দিন শেষ হয়ে গেছে এবং সময় এসেছে কারিগরী ক্ষেত্রে বিকল্পধারার নির্মাতাদের কাজে পেশাদারিত্বের ছাপ রাখার।

দেশীয় চলচ্চিত্রের যেটা মূল ঘাঁটি সেই এফডিসি তথা এস্টাব্লিশমেন্টের ভেতরে ও বাইরে কাজ করাটা শিখতে হবে। মন্ত্রণালয়েরও বাইরে ও ভেতরেও! এ এক জটিল দ্বান্দ্বিক পথ। আরো বিপদ, আমাদের সামনে পূর্বসূরীদের কোনো পথরেখা নেই। অবস্থা বিবেচনায় এনে আমাদেরকে নিজেদের পথ নিজেদেরই তৈরী করে সামনে এগোতে হবে।

বিকল্প নির্মাতাকে কেবল ভালো চলচ্চিত্র পরিচালক হলেই চলছে না। ছবি প্রদর্শনের ব্যাপারে তাকে একজন ভালো সংগঠকও হতে হবে। অন্যথায় টিঁকে থাকা যাবে না। আসলে সব কাজেই সংগঠন দরকার। নিজেকে সংগঠিত করা। আর তার জন্যে প্রয়োজন প্রস্তুতি— নান্দনিক ও আর্থিক। যারা তা না করে ছবি বানাতে এসেছিলেন খুব দ্রুতই তাদের রোমান্টিসিজম উবে গেছে। অনেকে আজ সীনিক হয়ে পড়েছেন, যে অসূয়াবৃত্তি একজন শিল্পীর জন্যে মৃত্যুঘন্টা বিশেষ। একজন সৃজনশীল শিল্পীকে হতেই হবে ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী। ঈর্ষা, অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতা এসব কোথাও নেবে না। প্রয়োজন সতীর্থ ও সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি। আর তাই বিকল্প চলচ্চিত্রকার ও কর্মীদের মধ্যে আদর্শিক যৌথতাবোধটা খুব জরুরী। আমাদের নিজেদের মধ্যে চিন্তা ও কাজের মধ্যে অনৈক্য থাকলে শত্রুরা সুযোগ নেবে।

যখন আমাদের দুঃসময় তখন সরকার বা পুঁজিপতিদের কাছে নয়, যেতে হবে-- জনগণের কাছে। তবে জনগণের কাছে যেতে হলে ছবির মান সত্যিকার অর্থেই ভালো হতে হবে। জনগণ যেন উপভোগের আকর্ষণেই আমাদের ছবি দেখতে আসেন। নিছক দায়বদ্ধতার কারণে নয়।

এস্টাব্লিশমেন্ট দু'ভাবে আমাদের ধ্বংস করতে চায়। একটা হচ্ছে— চরম অবহেলা, ইংরেজী করে বললে, kill by silence, যা দীর্ঘদিন ধরেই আমাদের ব্যাপারে করে আসা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে এর আরেক বিপরীত— থালায় ভরে পুরস্কার দিয়ে মুখ বুজিয়ে ফেলা! এসব পুরস্কার-টুরস্কারে আত্মশ্লাঘার কিছু নেই। প্রতিবাদী চেতনাটা, যা আমাদের বিকল্প সিনেমার প্রাণভোমরা, তাকে যে কোনো মূল্যে, আঁচলের ভেতর, বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

ছবি নির্মাণ করতে হবে স্বল্প ব্যয়ে। বাজেট যত বড় হবে ততই প্রবণতা বাড়বে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কম্প্রোমাইজ করা অথবা কোনো প্রযোজকের কাছে বাঁধা পড়ে যাওয়ার। আরেকটি বিষয়ও জরুরী। তা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে ছবি তৈরী করে যাওয়া। একটি ভালো ছবি করে বসে থাকলেই চলবে না।

আসলে আত্মসন্তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। সত্যিকারের ভালো ছবি বিকল্পধারায় খুব কমই হয়েছে। এ ধারার পরিচালকও কম। বর্তমানে বিকল্পধারা যে পর্যায়ে রয়েছে এভাবে চলতে থাকলে বাংলাদেশের বিকল্প চলচ্চিত্রের ম্রিয়মাণ এই ধারাটিকে ভবিষ্যতে টিঁকিয়ে রাখাও মুশকিল হবে।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের বর্তমানে খুবই দুরবস্থা। তারপরও যেহেতু সামাজিকভাবে অনুমোদিত বিনোদনের ব্যবস্থা আর খুব বেশী নেই, ফলে সিনেমার এখনও ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে আমি মনে করি।

এদেশের চলচ্চিত্রকে অনেক দোষারোপ করা হয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, নাটক, এসব শিল্পেরই বা কী অবস্থা? চলচ্চিত্র বিভিন্ন শিল্পধারার সমন্বয়ী এক শিল্প। একটা সমাজে অন্যান্য শিল্পের শাখা তেমন বিকশিত না হলে কেবল চলচ্চিত্রের কাছে খুব বেশী আশা করা ঠিক নয়।

আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের একটা গরীব দেশে সরকার হচ্ছে সবচে বড় সামাজিক সংগঠন। এদেশে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্রের বিকাশে সরকার তাই তার দায় এড়াতে পারেন না। কিছু দাবী তো আমরা সরকারের কাছে করতেই পারি। যেমন বিকল্প ছবির জন্যে সরকারী অনুদান। কিম্বা প্রমোদকর মওকুফ। কিন্তু আমি বুঝি যে শেষ পর্যন্ত আমাদের গাড়ী আমাদেরকেই ঠেলতে হবে। সরকার আসে, সরকার যায়, কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র একই থাকে— সাম্প্রদায়িক, আমলাতান্ত্রিক ও শিল্পবোধহীন ফিলিস্টাইন। ফলে আমাদের প্রত্যেককে একজন চলচ্চিত্রকর্মী হওয়ার পাশাপাশি এস্টাব্লিশমেন্টবিরোধী রাজনৈতিক কর্মীও হয়ে পড়তে হচ্ছে। আর তার প্রভাব আমাদের ছবিতেও হয়তো ছাপ রাখে। তাই এটা বোধহয় খুব আশ্চর্য্যের নয় যে আমাদের ছবিগুলির বেশী প্রদর্শনী হয় ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত, ঐতিহ্যগতভাবেই এদেশের মূল রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিশেষ দিনগুলোতে।

আর আমার ব্যক্তিগত একটা অনুভূতি হচ্ছে চলচ্চিত্র বিষয়টি তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে না থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে ভাল। কারণ চলচ্চিত্র বিষয়টা সংস্কৃতির— নয় কী? আর বড় কারণ, তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিভাগ আছে— সংবাদপত্র ও টেলিভিশন। সক্কালবেলা খবরের কাগজ খুল্‌লেই তো তার সরকারের সমালোচনা-টমালোচনাগুলো পড়ে মন্ত্রীসাহেবের চান্দি গরম! তাছাড়া টিভি-তে খবরের কোন্ লাইনের আগে কোন্ লাইন যাবে, কোন প্রোগ্রাম যাবে বা যাবে না, গেলে কতটুকু যাবে, এসব নিয়ে মন্ত্রী ও সচিবরা সারাদিনই উত্তেজিত থাকেন। চলচ্চিত্রের মত একটা পেলব বিষয় নিয়ে তাঁরা ভাববেন কখন ! কিন্তু পক্ষান্তরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে কাজের চাপ কম। তাছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য বিভাগগুলির চেয়ে চলচ্চিত্র বেশী আকর্ষণীয় বিধায় চলচ্চিত্র ওখানে হয়তো মনোযোগও বেশী পাবে।

আগামীদিনের বিকল্প নির্মাতাদের এক প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হচ্ছে— প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ। এ উপমহাদেশে গৌতম ঘোষের মত অনেক ভালো চলচ্চিত্রকারের যাত্রাই শুরু হয়েছিল প্রামাণ্যচিত্র চলচ্চিত্র দিয়ে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রামাণ্যচিত্রের অবস্থা ভালো নয়। এনজিও-রা কিছু ডকুমেন্টারী বানায় তবে তা স্থূলভাবে প্রচারধর্মী। সরকারী প্রতিষ্ঠান ডিএফপি কিছু ডকুমেন্টারী, বা আরো সঠিক বললে *ফুটেজ* তোলে বটে, কিন্তু ডিএফপি-র কোনো কাজ পাওয়াটা নির্মাতার দক্ষতার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে ডিএফপি ও মন্ত্রণালয়ের কর্তাদেরকে দেওয়া ঘুষের পরিমাণের উপর! এছাড়া প্রামাণ্যচিত্র দেখানোরও জায়গা নেই তেমন। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো প্রামাণ্যচিত্র দেখাতে আগ্রহ বোধ করে না।

এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, ছবিটি ফিল্ম ফরম্যাটে বানানো হবে না ভিডিও ফর্ম্যাটে, তা নিয়ে কোনো আদর্শিক বিরোধের সুযোগ আজ আর নেই। ভিডিও ফরম্যাট, বিশেষ করে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যাপক বিকাশের এই যুগে, তার নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। এখন প্রশ্নটা প্রায়োগিক, কোন্ ছবির জন্যে কোন্ মাধ্যম? নির্মাণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দুই মাধ্যমেরই কিছু বাস্তব সুবিধা-অসুবিধার দিক আছে। যে ছবির জন্যে যেটা অধিকতর সুবিধা। *"একটি গলির আত্মকাহিনী"* ছবিটি আমি ভিএইচএস-য়ে বানিয়েছিলাম! তাতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি।

বিকল্প সিনেমার একটা বিষয় আমাকে ভাবায়। মুক্তিযুদ্ধ, নারীমুক্তি, শিশুশ্রম, এরকম বিষয়ভিত্তিক ছবিই কী তৈরী হবে সর্বদা? শিল্পের লক্ষ্য তো কেবল তাৎক্ষনিক কোনো বিষয় নয়, লক্ষ্য হচ্ছে— মানুষ। চিরন্তন মানুষ। Man with a Captial M ! মানুষকে নিয়ে সেরকম জীবনগভীর শিল্প কী হবে না আমাদের চলচ্চিত্রে? ওই যে মার্কস বলেছিলেন, *শীলারীয় না করে শেক্সপীয়ারীয় করতে!* বিষয়টা ভাবায় আমাকে।

আরেকটা জিনিষ অনুভব করতে পারছি যে আগামীতে প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলি বেশ বড়ভাবেই চলচ্চিত্র প্রযোজনায় আসবে। পুরনো ধারার চলচ্চিত্র প্রযোজকেরা হয় বসে পড়েছেন অথবা হারিয়ে গেছেন। এখন এই যে নতুন বাস্তবতা, টেলিভিশন চ্যানেলগুলি ছবির প্রযোজক, বিকল্পধারার নির্মাতাদেরকে এই বিষয়টাকে নিজেদের অনুকূলে আনতে হবে। এবং এগোতে হবে সাবধানে!

তবে একটা জিনিষ আমি বুঝি যে দেশে একটা ফিল্ম ইনস্টিটিউট তৈরী না হলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আগামীদিনের আনোয়ার হোসেনরা কোথা থেকে সৃষ্টি হবেন? আর প্রয়োজন একটা *ন্যাশনাল ফিল্ম সেন্টার*— কলকাতার *"নন্দন"*-য়ের মত যেখানে নিয়মিত চলচ্চিত্র উৎসব ও ফিল্ম রেট্রোস্পেকটিভসমূহ অনুষ্ঠিত হবে। চলচ্চিত্র মাধ্যমটার প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে একটা কেন্দ্রে একীভূত করা অত্যন্ত জরুরী।

চাকা এখনও ঘুরছে। পুরো ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু আরো অনেকের মত আমিও বিশ্বাস করি ও আশা করি যে বিকল্প সিনেমার মাধ্যমেই বাংলাদেশে একদিন শিল্পিত ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ উন্নত এক সিনেমার আবির্ভাব ঘটবে। আর এক্ষেত্রে যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে দেশের মাটি, এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নের সঙ্গে পরিচালকদের সার্বক্ষণিক নাড়ীর যোগাযোগ। তাহলেই সেটা সম্ভব হবে।

তবে এটাও আশার কথা যে এদেশে যারা বিকল্পধারায় ছবি তৈরীর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তারা একদম শূণ্য থেকে একটা গোটা ছবি নির্মাণের ও তা প্রদর্শনের অভিজ্ঞতায় পোক্ত। চলচ্চিত্র পরিবেশন ও

প্রদর্শনের গোটা প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে এ যুদ্ধক্ষেত্রটির আঁটঘাঁট তারা জানেন। তাঁদের হারানো সহজ হবে না!

আর আমার নিজের কথা যদি বলেন তাহলে বলব গীতার ওই উপদেশটা আমি সর্বদা মনে রাখি *"কর্মের অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"*— কর্মেই আমার অধিকার, ফলের পেছনে ছোটা নয়। আমার কাছে সব সময়ই, হাতের কাজটা শেষ হলেই, আরেকটা ছবি তৈরীর যুদ্ধে নেমে পড়াই— সবচে বড় আকর্ষণ। বিকল্পধারায়!

= 0 =